এর মধ্যে মহিলা সংঘের ভেতর কিছু ভাঙাগড়া হল। তৈরি হল যৌনকর্মীদের 'মহিলা সমন্বয় কমিটি'। ১৯৯৬-এর এপ্রিলে সমন্বয় কমিটি কোলকাতায় তাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে। বিভিন্ন জেলার, অন্য রাজ্যের, এবং বিদেশেরও কিছু যৌনকর্মী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন 'ভদ্র' সমাজের 'মান্য' জনেরা। সেখানে কমিটির পক্ষ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি ওঠে। প্রশ্ন তোলা হয় - নারী নির্যাতনকারী 'পিটা' (Prevention of Immoral Traffic Act) আইন বাতিল করা হবে না কেন? এই অমানবিক পেশা সমাজ থেকে দূর করার লড়াইতে তথাকথিত ভদ্র সমাজ কি সামিল হবে? ঘোষণা করা হয় - "আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা চাইছি যৌনকর্মী পরিচালিত একটি স্বশাসিত বোর্ড, যে বোর্ড মেয়েদের এ পেশায় ঢোকা, এবং যৌন ব্যবসার নিয়মনীতি ও যৌনকর্মীদের সার্বিক উন্নয়নের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবে।"

এর আগে ১৯৯১ সালের এপ্রিলে, আমরা চমকিত হয়েছিলাম নিম্ন বাই-এর খবর জেনে। ভারতের ইতিহাসে প্রথম সে ঘটনা। পেশায় 'বেশ্যা' নিম্ন বাই দিল্লীর চাঁদনী চক কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ১০ম লোকসভা নির্বাচনে। নির্বাচনী প্রচারে নিম্নর দলের দাবিগুলো ছিল-পতিতাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ চাই, চাই বৃদ্ধ বয়সে বাসস্থান ও নিরাপত্তা, মাতৃ পরিচয়ে শিশুর পরিচয় বৈধ করা চাই। 'বেশ্যাবৃত্তি' টিকিয়ে রাখার কোনো দাবি সেদিনও উচ্চারিত হয় নি।

গাইছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায় উৎস মানুষের আড্ডায়। মগ্ন শ্রোতা অশোক

হল ১৯৯৭-এর নভেম্বর মাসে, কোলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে, সোনাগাছি-কেন্দ্রিক যৌনকর্মীদের জোরদার, সংগঠন 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি' আয়োজন করেছিল সেই সাড়ম্বর ব্যয়বহুল "যৌনকর্মীদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন"। দেশ-বিদেশের মোট ৩০০০ স্বঘোষিত যৌনকর্মী, আমন্ত্রিত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, রাজনীতিক, সাংবাদিক, টিভি রেডিও ভিডিও টেলিক্যামেরা, আর ঝকমকে আধুনিকা স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের নিয়ে চোখ-ধাঁধানো বর্ণাঢ্য জমায়েত। গণিকাবৃত্তির অমানুষিক যৌনলাঞ্ছনা অপসারণের জন্যে নয়, বিকল্প সুস্থ পেশা বা সামাজিক পুনর্বাসনের রাস্তা খোঁজার জন্যেও নয়, এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেই অভিনব দাবিকে সামনে তুলে আনা - "যৌনকর্ম একটা 'কাজ', এ কাজের আইনী স্বীকৃতি চাই, যৌনকর্মীদের শ্রমিকের অধিকার দিতে হবে।"

এ কেমন ধারা দাবি?

ধাক্কা সামলাতে সময় লাগে। পুরুষের ভোগ-লালসার প্রয়োজনে নারীর চরম অমর্যাদা যে পেশার চরিত্র, অসহায় রমণীর দেহকে টাকা দিয়ে সুলভে পণ্য হিসেবে কিনে নেওয়া যায় যে পেশায়, সেই পেশাকে নির্মূল করার লড়াই সংগঠিত না করে তাকে টিকিয়ে রাখা? তাকেই একজন শ্রমিকের কাজের সমতুল্য করার আয়োজন? কতখানি সমর্থনের যোগ্য এই দাবি? বিভ্রান্তি আসে। আর, এই বিভ্রান্তি আসে বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগও আসে।

ইদানীং দেখনদারি সুবিধাবাদী কালচারের বেশ বাড়বাড়ন্ত। বর্তমানের অনেক নামডাকওলা কবি শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকার বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান বেশ কুশলী, পাঁকাল মাছের মত। মানি, মিডিয়া, সম্বর্ধনা, উপঢৌকন দিয়ে এনাদের হাসি-হাসি মুখে মঞ্চে বসানো যায়। ফরমায়েস মাফিক বাহবা টাহবা দিয়ে কাজ সারেন এঁরা। তারপর সুরুৎ করে জনান্তিকে চলে যাওয়া, মুখে কুলুপ আঁটা। ... এই পরিস্থিতিতে 'দুর্বার'-এর পরিচালকরা পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু "খ্যাতনামা"-র সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন। যেমন, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি (২০০৫) বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার প্রচুর আবেগ-মাখানো কথনে সহানুভূতি ঢেলে দিলেন উদার চিত্তে ; কোনো সার্বিক ভালোমন্দ নিয়ে বিশ্লেষণ নেই, সমাজ সংস্কৃতির সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে কোনো অভিমত নেই। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক দায়িত্বের এই বহর দেখলে রীতিমত দুশ্চিন্তা হয়।

তবে সবটাই এরকম জেগে ঘুমানোর চিত্র নয়। খোলা মনে সোজা কথাটা বলে দেওয়ার মত 'কণ্ঠ' এখনো শোনা যায়, এটাই ভরসা। .. ১৯৯৭-এ 'জাতীয় যৌনকর্মী সম্মেলনে' সেই সাড়া জাগানো দাবিটি উত্থাপিত এবং মিডিয়া প্রচারিত হওয়ার পরই প্রখ্যাত সমাজকর্মী রামী ছাবরা ৮ জানুয়ারি ১৯৯৮ 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় লিখলেন - "একজন বারবণিতার পেশাকে সাধারণ ব্যবসা'র বৈধতা দেওয়ার অর্থ আইন ও মনুষ্যত্বের মর্যাদার লঙ্ঘন। অন্ধকার জগতের পেশায় লিপ্ত থাকলেও একজন পতিতার নাগরিক হিসেবে মানবিক অধিকার থাকে। তাহলে, মানব-অবনমন আর মানবাধিকার কি একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলবে? কেন এই বিষয়টি জনসাধারণের কাছে বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত হবে না! 'পাপ'কে প্রতিহত করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় কি?" ১ এপ্রিল ২০০১ আনন্দবাজারে বাণী বসু লিখলেন- "এঁদের দাবির সপক্ষে বলা হচ্ছে বারবধূরা নাকি একটা পরিষেবা দিচ্ছেন। কিছু অস্বাভাবিক পুরুষ নিজ স্বার্থে এঁদের যৌনদাসী করে রেখেছে, এরই নাম পরিষেবা? কী ভয়ঙ্কর কথা! ... মান্যগণ্যরা দেখলাম মঞ্চে বসে বললেন, কাজটি নাকি নৈতিক। এঁদের পেশাটি নৈতিক হলে পুরুষের অনাচারটিও নৈতিক হয়। নারীমাংস ব্যবসাটিও অনৈতিক থাকছে না আর। এই মান্যগণ্যরা মধ্যযুগের নারীমাংস-হাটে ফিরে যেতে চাইছেন। মানুষ মানুষকে পণ্য করছে, এটা মনুষ্যত্বের অপমান নয়?"

গত ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ৭নং রাউডন স্ট্রীটে একটি ঘরোয়া সভা হয়, যৌনকর্মীদের দাবি নিয়ে বিতর্ক সভা। সেখানে তসলিমা নাসরিন 'দুর্বার'-এর কর্তাব্যক্তি ও নেত্রীদের সরাসরি বলেন—পতিতাবৃত্তিকে যৌনকর্ম বলুন আর 'কাজ'ই বলুন, এ তো পুরুষতন্ত্রের কদর্য প্রতীক। পুরুষের আরাম আয়েশ আহ্লাদ মেটানোর জ ন্য, পুরুষের ধর্ষকামের

শিকার হওয়ার জন্য নারীকে নিয়োজিত করা। বেশ্যা নিয়ে পুরুষতন্ত্রের ফূর্তিতে জীবন কাটানোর ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার দাবি কেন করবেন আপনারা? আদিম অত্যাচারের অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই না করে টাকার বিনিময়ে এই পুরুষতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখায় সামিল কেন হবেন? দাবিদার 'দুর্বার'-এর কাছে এসব কথা পছন্দসই লাগেনি বোঝা গেছিল; তাঁদের তিনজন মুখপাত্র এসেছিলেন সভায়। নিজেদের দাবি জোর গলায় পুনরাবৃত্তি করে চলে যান তাঁরা, কোনো বিতর্কের সুযোগ না দিয়েই।

মুশকিল হল যৌনকর্মীদের ব্যক্তিগত মনের খবর প্রকাশ হয় না। বিভিন্ন সম্মেলন, সভা, সেমিনার, গণমাধ্যমে দুর্বার-এর প্রখর কর্মীবক্তারা, অদ্ভুতভাবে, ছকে বাঁধা কথা সর্বদা সর্বত্র একই সুরে বলে যান—"আমরা পরিষেবা দিচ্ছি। এটা একটা 'কাজ'। সমাজে বহু সাংসারিক অসুস্থতা কাটাতে সাহায্য করি আমরা। যৌনকর্ম হল প্রকৃত কর্ম। আমরা কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করি। আমরা শ্রমিকের বৈধ অধিকার দাবি করি।" ব্যস্। কোনো সরাসরি বিতর্কে যেতে তাঁদের খুব অনীহা। এনাদের কথাগুলো বারবার শুনলে যে-কারুর মনে হবে যেন পাখীপড়া বুলি, হোমওয়ার্ক করা, যেন পেছনে থেকে এঁদের মুখে কথাগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। .. আর ওঁরা? ওই যে দূরে আড়ষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অপুষ্ট মামুলি সাধারণ যৌনকর্মীরা, বিলকিশ গায়ত্রী পাতনি রেখা আয়েশা মালা, যাঁদের মুখ থেকে সহজে কথা বেরোয় না, যাঁরা মিছিলের শেষ দিক ভরাট করেন সবসময়, ওঁরা কী বলেন? শোনা যায় না।

মনের আসল ইচ্ছে আসল দাবি তো জানা যায় কাজে, কথায় নয়। একটু চেনা পরিচয় হলেই বোঝা যায়, 'লাইনে'র মেয়েদের সবারই মনের কথা হল—আমাদের সন্তানরা যেন কোনদিন-ই এ লাইনে না আসে; তারা যেন লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকের সমাজে মিশে যেতে পারে।

মনের আসল ইচ্ছে আসল দাবি তো জানা যায় কাজে, কথায় নয়। একটু চেনা পরিচয় হলেই বোঝা যায়, 'লাইনে'র মেয়েদের সবারই মনের কথা হল—আমাদের সন্তানরা যেন কোনদিন-ই এ লাইনে না আসে; তারা যেন লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকের সমাজে মিশে যেতে পারে। বছর খানেক আগে শেঠ গলির গীতা কাগজে খবর হয়েছিল, ছবিসহ। দুর্বার-এর এই সক্রিয় সদস্যা এডস্ আক্রান্ত হয়েছে, দুর্বার কমিটি তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিল, প্রচার-মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল। সুশ্রী চেহারার সেই যৌনকর্মী গীতা আজ এডস্ এর মরণ-কামড়ে কঙ্কালসার। এ-হাসপাতাল ও-হাসপাতাল ঘুরে এখন স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন-এ ধুঁকছে। দুর্বার তাকে ত্যাগ করে যায় নি অবশ্যই, কিন্তু গীতা তার অতীতকে ত্যাগ করতে চায়। তার শেষ জীবনের একমাত্র চিন্তা—মেয়ে পূর্ণিমা। সে যাতে কোনো আশ্রম বা হোমে বড় হয়ে উঠতে পারে, যেন কোনোদিন তার মায়ের পাড়ায় পা না রাখে। গীতা আজ ভুলেও দাবি করে না এই কদর্য পেশা টিকে থাকুক।

কেবলমাত্র গীতা নয়, শান্তিপুর ছোটবাজারের শিখা বসাক, শেওড়াফুলির রিঙ্কি ভগৎ, রমা দাস, শেঠ গলির শান্তি, কালীঘাটের আসমা বিবি—এরকম শ'য়ে শ'য়ে যৌনকর্মী মা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁদের সন্তানদের এ পেশা থেকে দূরে রাখতে। তাঁরা যেভাবেই হোক, বাচ্চাদের কোনো ভালো হোম বা আশ্রম বা কোনো দরদী সংস্থার আশ্রয়ে রাখতে চাইছেন খরচ খরচা দিয়ে, যেখানে লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে ওরা ভদ্রসমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। যৌনকর্মে নিজের মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য পেশা-স্বীকৃতির দাবি এঁদের কারুর নয়। আমাদের খেয়াল পড়বে, দুর্বার-এর আগে আর কোনো যৌনকর্মী সংগঠন বা কোনো আগুয়ান যৌনকর্মী এরকম দাবি করেনি।

তাহলে এ কাদের দাবি?

সেটাই গূঢ় প্রশ্ন। কাদের দাবি? যাদের বুদ্ধি পরামর্শ পরিকল্পনা আর সাহায্য নিয়ে 'দুর্বার' এই দাবিটাকে তাদের ফেস্টুনে তুলে নিয়েছে, সেই নেপথ্যচারী এন. জি. ও.-র শিক্ষিত চৌখশ 'ভদ্র' ঘরের পরিচালক, নেত্রী ও সংস্থাকর্মীরা (যাঁরা যৌনকর্মী নন), তাঁরা কি এ দাবির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সামিল হবেন? যদি কখনো যৌনপেশা এ রাজ্যে আইনি স্বীকৃতি পায়, 'যৌনকর্মী নিয়োগ কমিশন' তৈরি হয়, তখন কি ওই এন. জি. ও. কর্তা কর্মীরা তাঁদের ঘরের মেয়েদের সে 'কাজ' নিতে পাঠাবেন?

জানা কথা পাঠাবেন না। বেশ্যার কাজ কেউ সাধ করে নেয় নাকি? বরং এখন যেমন করছেন তাঁরা, 'ভদ্র' সমাজে থেকে, 'ভদ্র' স্কুল-কলেজে পড়ে, 'ভদ্র' কেরিয়ার করা, 'ভদ্র' সংসার গড়া, সেরকমই করবেন। তবু কিন্তু ওনারা যৌনকর্মীদের পেশা-স্বীকৃতির দাবি আদায়ের আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন। হিসেবের গরমিলটা এখানেই। কেমন যেন অভিসন্ধির গন্ধ পাওয়া যায়।

তাই, অমানবিকতা অমর্যাদা ঘৃণা লাঞ্ছনার থেকে মুক্তির স্বপ্ন যদি দেখতেই হয় তবে এই নিকৃষ্ট যৌনপেশার বিকল্প কোনো সুস্থ নিরাপদ কাজের দাবি কেন নয়? কেন গ্রাম-মফঃস্বলের দারিদ্র্য-তাড়িত যৌনকর্মী মেয়েদের স্থানীয়ভাবে অর্থ-সংস্থান প্রকল্পের দাবি উঠবে না? এ দাবি সহজে পূরণ হবার নয় ঠিকই, কিন্তু কোন সামাজিক অর্থনৈতিক লড়াইটা সহজে জেতা যায়? লড়াই চালিয়ে তো যেতেই হয়। 'পিটা' বাতিল করে 'যৌনব্যবসার বৈধতা কায়েম করাটাও কি সহজে হবে? ১৯৯৭-এ সল্টলেক স্টেডিয়ামের সেই প্রথম জাতীয় সম্মেলনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত স্বয়ং উপস্থিত থেকে যৌনপেশার মেয়েদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেসব আজ কোথায়? ইন্দ্রজিৎবাবু প্রয়াত হয়েছেন। আমদের দেশে বা রাজ্যে প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্য বোধহয় দেওয়া হয় না।

অর্থ আর রাজনীতির খেলা আমরা বারবার নানা রূপে দেখি। সে খেলায় দাবার ঘুঁটি হবে কেন 'দুর্বার'? হাজারো বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা মেয়েদের নিয়ে দুর্বার লড়াই যদি চালাতেই হয় তবে তা নারীর স্থায়ী যৌনদাসী হয়ে থাকার বিরুদ্ধে চালিত হোক। তাদের ভাঙিয়ে খাওয়ার কৌশলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ যৌনকর্মীদের প্রকৃত দুর্বার হয়ে ওঠা এখন সবচেয়ে জরুরী।

যৌনদাসী না যৌনশ্রমিক—বিশেষ সংখ্যা আগস্ট ২০০৫-এ প্রকাশিত

দুঃখে, সুখে, বিবাদে

পবন মুখোপাধ্যায়

'আমার বন্ধু রইলো কোন দেশে গো
আমি ক্যামনে ঘরে রই'

১৭ নভেম্বর, ২০০৮ বিকেল। কলকাতা থেকে ক্যানিং, কৃষ্ণনগর পৌঁছে গেল অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের খবর। অশোক আর বেঁচে নেই জেনে ফোন যাচ্ছে, ফোন আসছে। বিশ্বাস করতে না পেরে ফোনে অশোকের বন্ধু, গুণিজন, আত্মীয়রা খোঁজ নিচ্ছে।

প্রায় একটা মাস কলকাতার বিভিন্ন নার্সিংহোমে ঘুরে ঘুরে অশোক বাঁচতে চেয়েছিল। শেষে খিদিরপুরের ক্যালকাটা মেডিক্যাল হাসপাতালে বেঁচে থাকায় যবনিকা পড়ল। গোটা পঁচিশটা বছর অশোকের সঙ্গে আমার বাস। বহু সমস্যার, বহু আন্দোলনের সাথী, বহু যন্ত্রণার ভাগীদার। বহু তিক্ত পরিবেশের সাক্ষী। বহু সিদ্ধান্তের প্রবল বিরুদ্ধকারী। আবার অংশীদারও বটে। তবু সম্পর্ক ছিল অমলিন। ব্যক্তিগত দ্বেষ ছিল না। অভিযোগ ছিল সংগঠনকে সাংগঠনিক রূপ না দেবার প্রশ্নে। 'উৎস মানুষ'কে অপত্যস্নেহে প্রতিপালন করতে গিয়ে যুক্তির ধার হার মেনেছিল। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া 'উৎস মানুষ' অনেকে যেমন ভাবতে পারেন না। অশোক নিজেও সে রকম ভাবত। 'উৎস মানুষ' অশোকের। খোলাখুলি এ কথা ও বলত। উৎস মানুষ বহুবার নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কখনও অশোক নিজে সমালোচিত হয়েছে ওর সিদ্ধান্ত গ্রহণে। বহু কঠিন মুহূর্তে ওকে বলতে শুনেছি আমি 'উৎস মানুষ' বন্ধ করে দেব। এটি অসাংগঠনিক মত, অগণতান্ত্রিক। বহুবার ওকে বুঝিয়েছি। বলেছি এটা আমাদের দর্শন ও চিন্তার বিরুদ্ধমত। কখনও বুঝেছে, কখনও এড়িয়ে গেছে। একটা সময় 'উৎস মানুষ'-এ বহু বন্ধুর সমাগম হয়েছে, পরে তারা চলে গেছে বিভিন্ন কারণে। কিন্তু 'উৎস মানুষ' পত্রিকা বন্ধ হোক এটা চায়নি। এতে যে অশোক মানসিক, দার্শনিক, সাংগঠনিকভাবে লাভবান হয়েছে, তা নয়। নিজেও সেটা বুঝেছে, পারে। তখন অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে 'উৎস মানুষ'-এর অস্তিত্বে, ব্যাপ্তিতে এবং সামগ্রিক ভাবে আন্দোলনে, যে আন্দোলন তাঁর স্বপ্ন ছিল। শেষের দিকে একে একে বন্ধুদের চলে যাওয়ায় মানসিকভাবে অশোক ভেঙে পড়েছিল। অবসাদ, যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল। এটাই ওর রোগকে বাড়িয়ে তুলেছিল বলে আমার মনে হয়।

অশোক কোনোদিন পরিবার, বিবাহ, রুটিন মেপে সাংসারিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল না। দ্বন্দ্ব, অশান্তি একদম পছন্দ করত না। দেহদানের অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু করা গেল না। এটা অশোককে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে জানি না। কিন্তু 'উৎস মানুষ'-এর সামগ্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হল, কলুষিত হল। এ কথা সৌজন্যের খাতিরে অনেকেই বলবে না। কিন্তু এটা ঘটনা। এমনটি না ঘটলে 'উৎস মানুষ'-এর মতাদর্শ অনেক বলিষ্ঠ হত। পাঠকেরা লাভবান হত।

অশোকদার সঙ্গে পরিচয়: 'মানুষ' পত্রিকার উদ্যোগপর্ব

১৯৭৮-৭৯ সাল। বিড়লা মিউজিয়াম। চাকরিসূত্রে পরিচয়। সদ্য অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিড়লা মিউজিয়ামে 'গাইড লেকচারার' পদে যোগ দিয়েছে। নিয়মিত অফিস ক্যান্টিনে আসার সূত্রে আলাপ, বন্ধুত্ব, সান্নিধ্য। একদিন একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা নিয়ে কথা হল। অশোক চাইছিল নতুন বিষয়, নতুন ভাবনা, সহজ ভাষায় ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, সামাজিক মূল্যবোধকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এতদিন কোনো পত্রিকা, কোনো সংগঠন লাগাতার চর্চার মধ্যে দিয়ে এই কাজগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি, তার অভিমত। আমিও অশোকদার ইচ্ছায় ইন্ধন জোগালাম। কাজ হল। পত্রিকার নাম ঠিক হল 'মানুষ'। নামটা ওরই দেওয়া। বিষয় ভাবনা মূলত বিজ্ঞানকে ঘিরে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, বিবেকিসত্তা ও মানবিক মূল্যবোধগুলোকে একটু ঝাঁকিয়ে দেওয়া। বিড়লা মিউজিয়ামের আমাদের আর এক সহকর্মী বন্ধু প্রদীপ দত্ত জুড়ে গেল আমাদের সাথে। পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকে দিল আর এক সহকর্মী বন্ধু সমীর মণ্ডল। সমীর তখন নাম করা শিল্পী। মুম্বইয়ে থাকে। বেছে নিলাম নিবারণ সাহাকে। সেও বিড়লা মিউজিয়ামে আমাদের সাথে কাজ করত। নিবারণদার সাহায্য সহযোগিতা ঐ দিন না পেলে 'মানুষ' থেকে 'উৎস মানুষ' দীর্ঘ চলার পথ এতটা দীর্ঘায়িত হত বলে আমার মনে হয় না। লেখালেখির জোগাড়ে অশোকদার জুড়ি মেলা ভার। লেখকের পেছনে লেগে থাকতে পারত। কিন্তু শুধু লেখা দিয়ে তো পত্রিকা বের হবে না, চাই ছাপার পয়সা। টাকা কোথা থেকে আসবে? জি পি এফ ফাণ্ড থেকে লোন নেওয়া, বন্ধুদের কাছে হাত পাতা। টাকা জোগাড় হয়ে গেল।

নাম ঠিক হল। দাম ঠিক হল। ৭৫ পয়সা। ছাপা হবে ৫০০ কপি। ১৯৮০ সালে জানুয়ারি মাসে প্রথম 'মানুষ' প্রত্রিকার আত্মপ্রকাশ। বন্ধু পৃথ্বীশ সাহার প্রেস থেকে 'মানুষ' পত্রিকা ছেপে বের হল। ঐ পর্যায়ে বইপাড়ার বন্ধু চন্দন ঘোষ 'মানুষ' পত্রিকার বিক্রি ও প্রচারে খুব সাহায্য করেছিল। সাহায্য করেছিল 'কথাশিল্পর' অবনীদা, ওর দোকানে বই রেখে। আজকে অশোকের প্রয়াণে এই সব বন্ধুদের সাহায্য, সহযোগিতা খুব মনে পড়ছে। টানা একবছর পর ১৯৮১ সালে পত্রিকা রেজিস্ট্রেশন পেল। কিন্তু নাম পাল্টে হয়ে গেল 'উৎস মানুষ'। অশোকের একদম পছন্দ হয়নি নাম পাল্টে যাওয়ায়, কিন্তু উপায় ছিল না, তাই মানুষের আগে 'উৎস' জুড়ে দেওয়া গেল, ঠিকানা হলো অশোকের বাড়ি— বি ডি ৯৪ সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪। সেই চলা—

গাঢ় শূন্যতা

ভবেশ দাস

প্রতিবাদমুখর মনের চরিত্রটা সকলের একই ছাঁচে ঢালা নয়। প্রতিবাদী মনের উষ্ণতায় একবার কাজের নেশা ধরে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন। মিছিল স্লোগানের পথে না গিয়ে কাজের মধ্যে প্রতিবাদ বেশ দুঃসাধ্য। চিন্তার জগতে আলোড়ন ফেলা আরো শক্ত। তার চেয়েও কঠিন এর ধারাবাহিকতা রাখা, নৌকো ভাঙা হলেও তার হাল ধরে থাকা। এমন কাজের নেশা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে পেয়েছিলেন জানি না। কিন্তু উৎস মানুষ পত্রিকাটি গত শতাব্দীর আশির দশকে হাতে পেয়ে মনে হয়েছিল, গাঢ় শূন্যতার মধ্যে যেন আলো এসে পড়ল। ঝলসে ওঠা বিদ্যুতের মতো এমন একটা পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেল, যা হাতে পেয়ে মনে হল, মনের জমাট অনেক অন্ধকার দূর হতে পারে।

চারপাশে কুসংস্কার, অবিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানের কাণ্ড কারখানার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের এমন পত্রিকার নাম তো 'উৎস মানুষ' হওয়াই স্বাভাবিক। পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে কারও নাম প্রকাশিত হত না। ব্যক্তি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরালে থাকার জন্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠল 'উৎস মানুষ'-এর সঙ্গে। পঁচিশ বছর আগের কথা। তখন বাগুইআটিতে থাকতাম। নিয়মিত কিনতাম পত্রিকা। যত পড়ছি চমক লাগছে, ভুল ভাঙছে, সংশয় দূর হচ্ছে। প্রথম দিকের কোনো সংখ্যাতেই ছড়া বা কবিতা দেখিনি। তবুও ছন্দোময় কয়েকটি লাইন মনে এসেছিল। লিখেই মনে হয়েছিল 'উৎস মানুষ'-এর কথা। সেটা ১৯৮৪ সাল। পৃথিবী নামক এই গ্রহটাকে কেমন দেখছ?— এই প্রশ্নের উত্তরে মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা বলেছিলেন: 'খুব সুন্দর!' ঝটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, সুন্দর? কেমন সুন্দর? রাকেশের দেখা সুন্দর পৃথিবীতে দারিদ্র্য, অনাহার, ফুটপাথে শুয়ে থাকা শিশু, কিছুই কি দেখা যাচ্ছে না? এই জিজ্ঞাসাকে উচ্চকিত রেখেই লিখেছিলাম একটা কবিতা। ছাপা হতেও পারে এমন আশায় পাঠিয়েছিলাম। অবশেষে ডাকে 'উৎস মানুষ' পেয়ে আমি চমকিত। দেখি সত্যিই কবিতাটি ছাপা হয়েছে। দারুণ খুশি আমি। খুশি এই ভেবে যে আমি 'উৎস মানুষ'কে বুঝতে পেরেছি। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে নেবার একটা মন তৈরি হচ্ছে আমার। এরও মাসখানেক পর হঠাৎ একদিন একটা মানিঅর্ডার এল। কবিতার জন্য সাম্মানিক পাঁচ টাকা। দু-একটি প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকায় লিখে সম্মান-দক্ষিণা পেলেও তা ছিল প্রথাগত এবং নিয়মমাফিক। কিন্তু যে পত্রিকার অবয়ব এবং বিষয়ধর্ম বলে দিচ্ছে তাকে জাগ্রত রাখার জন্যই সকলের অকৃপণ সাহায্য প্রয়োজন, সেই পত্রিকা পাঠাচ্ছে সাম্মানিক? আমি অভিভূত। কয়েক বছর পর তখন আমি সল্টলেকে। একদিন আমাদের আকাশবাণী ভবনে বিজ্ঞান বিভাগে অশোকবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। সেদিন একসঙ্গে ফিরলাম সল্টলেকে। যদিও আগে আমরা সাক্ষাৎ না হওয়ার মতো দূরত্বে থাকতাম না। সেদিনের দেখাতেই মনে হয়েছিল দু'জনেই যেন এর প্রতীক্ষায় ছিলাম। তারপর তো অনেক বিষয়ে তিনি উৎস মানুষ-এর জন্য লিখিয়ে নিয়েছেন, স্বেচ্ছায়ও লিখেছি অনেক।

দীর্ঘদিনের শারীরিক অসুস্থতার মাঝেও প্রথমে তাঁর উদ্যমের অভাব দেখিনি। সমাজের যে অসংগতি ও সংকট তাঁকে পীড়া দিত, সেই বিষয়েই উৎস মানুষ-এ ভালো লেখা প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে একটি পত্রিকাকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু উৎস মানুষকে নির্দিষ্ট চরিত্রে চিহ্নিত করা যাবে না। নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে অনালোচিত গুরুত্বপূর্ণ এমন বিষয় আছে যাকে সহজেই জরুরি বিষয় করে নিতে পারত উৎস মানুষ। এই পত্রিকাকে ঘিরে অশোকবাবুর অবস্থিতিটা বোঝার জন্য আমি তাঁর অতি সাধারণ সম্পাদকীয় পড়তে খুবই উন্মুখ হয়ে থাকতাম। সম্পাদকীয়তেই ধরা থাকত তাঁর মনের ছায়া, অবসাদ, উদ্যম।

১৯৯৭ সালে একবার সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতার লাইন দিয়ে শুরু করেছিলেন। এই লেখাটা পড়েই বুঝতে পারি কতরকম সঙ্কটের সঙ্গে সহবাস করতে হত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য সঙ্কটকেই আশ্রয় করতেন তিনি। 'সচেতন সংবেদনশীল মানুষদের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, অসহিষ্ণুতা, ভালোবাসাহীনতা' তাঁকে কষ্ট দিত। আবার মানুষ হিসেবে এই সঙ্কটের উৎস নিয়ে (পত্রিকা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেও, টানা কয়েক মাস বন্ধ রেখেও) হঠাৎ উৎস মানুষ-এর একটা সংখ্যা বের না করে পারেন নি। আমার কাছে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতির অর্থ ঘোর সামাজিক সঙ্কটে, সঙ্কটকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের একজন খাঁটি মানুষের অভাব।

কঠিন কথা সহজ ভঙ্গিতে লেখার মানুষ ছিলেন। ওঁর সরল গদ্যের ভক্ত ছিলাম খুবই। পত্রিকা বের করতে হবে, উৎস মানুষ-এর আড্ডা বসাতে হবে, বিজ্ঞানের আলোচনায় এখানে সেখানে গ্রামে-গঞ্জে যেতে হবে—এসব বাদ দিয়ে তিনি যদি কলম হাতে লিখেই চলতেন, পাঠক সমাজ অনেক উপকৃত হতেন। কিন্তু ওই যে রোগ, ভাবুক হয়ে বসতে গেলে হাতে কলমে কাজ করে দেখানোর চাবুক এসে পড়ত পিঠে। প্রতিবাদী মনের উষ্ণতায় কাজের নেশাটা যাবে কোথায়? তিনি চলে গেলেন। কিন্তু অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে গেল আমাদের। আবার অনুভূত হচ্ছে কী যেন এক গাঢ় শূন্যতা।